চতুর্থ সেমিস্টার: PROGRAMME COURSE: DSC 4

আধুনিক কবিতা

স্টাডি মেটেরিয়াল

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত- শাশ্বতী

প্রশ্ন ৫। 'শাশ্বতী' কবিতার বিষয়বস্তু আলোচনা ক'রে এর শ্রেণি নির্দেশ করো।

উত্তর। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত একটি বিখ্যাত কবিতা 'শাশ্বতী'। এটি একটি অসাধারণ প্রেমের কবিতা। এখানে নায়িকা সামনে নেই। বহুকাল পূর্বে—'মনে হয় যেন শত জনমের আগে' সেই নায়িকার সঙ্গে কবির মিলন হয়েছিল। এ কবিতা সেই মিলনের স্মৃতিচারণা। সুধীন্দ্রনাথের প্রেম কবিতার সমস্ত বৈশিষ্ট্য 'শাশ্বতী' কবিতায় ফুটে উঠেছে। এ কবিতাটি কবির প্রেমভাবনার স্বগতোক্তি।

'শাশ্বতী' কবিতার তিনটি স্তবকের প্রথমটিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা করা হয়েছে, যে পরিবেশে সহজেই প্রিয়তমার স্মৃতি জেগে ওঠে। বর্ষণ শ্রান্ত বর্ষার ঋতু আকাশ থেকে বিদায় নিচ্ছে, আলোছায়ার লুকোচুরি খেলার মধ্যে শরতের আগমন বার্তা ধ্বনিত হচ্ছে; নীরব প্রতীক্ষার শেষে মাঠে, ঘাটে, বেজে উঠেছে আগমনীর সুর। কোজাগরীর আলোয় সব অন্ধকার ঘুচে যাবে এখনি। অর্থাৎ, প্রকৃতিতে এক মিলনোৎসবের আয়োজন হচ্ছে। এমনি পরিবেশে কবির মন চলে গেছে অতীত স্মৃতি রোমন্থনে—

"পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি;
এক বেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা।"

একবেণী হয়ে শয্যালগ্ন থাকা হ'ল নায়িকার বিরহের লক্ষণ। কবির হৃদয়ও যেন প্রাচীন নায়িকাদের মতো নিজের নায়িকার জন্য বিরহ কাতর।

কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে রয়েছে অতীতের মিলন-সুখের স্মৃতিচারণা। আজকের এই পরিবেশের মতোই বহুকাল আগের এক রাতে—

"সে এসে সহসা হাত রেখেছিল হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে।...."

সে দিন ফসলবিলাসী হাওয়া সেই নায়িকার পাকা ধানের মতো সোনালী চুল নিয়ে খেলায় মেতে ছিল। বোঝা যায়, কবির সেই নায়িকা ছিলেন বিদেশিনী। তিনি কবির হাতে হাত রেখে দৃষ্টি নত করেছিলেন। অর্থাৎ, কবিকে প্রণয় নিবেদন করেছিলেন। কবিকে হয়তো একটি কথায় তার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। কবির হৃদয়ে জেগেছিল এক অনির্বচনীয় সুখানুভূতি। সাত-সাতটি স্বর্গবাসের মিলিত সুখও যার তুল্য নয়। তাই কবি লিখেছেন,—

"একটি কথার দ্বিধা থর থর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;..."

সেই মিলনের ক্ষণটি কবি ভুলতে পারেন না। ক্ষণ মিলন হয়ে উঠেছে শাশ্বত। আর সেই ক্ষণকালের নায়িকা হয়ে উঠেছেন—শাশ্বতী। এদিক থেকে কবিতার নামকরণ তাৎপর্য পূর্ণ।

তৃতীয় স্তবকে কবি এই নায়িকাকে শাশ্বতী ক'রে তুলবার জন্যেই যেন প্রকৃতির সঙ্গে নায়িকাকে একীভূত ক'রে তুলেছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নায়িকাকে ক'রে তুলেছেন অতীন্দ্রিয়; অধরা সৌন্দর্যের বিষয়। পৃথিবীর অনামা, অজানা কুসুমে যেন সেই নায়িকার দেহসৌরভ ভাসে, ভরা নদী যেন তাঁরই আবেগের প্রতিনিধি, অমল আকাশ যেন তাঁর হৃদয়ের প্রতিফলন, শিশির হ'ল তাঁরই শরীরের স্বেদ; আর "সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে।"

নায়িকাকে প্রকৃতির অনুষঙ্গে অনুভব করার চেষ্টা করলেও কবির অন্তরে আর একটা তথ্যও জাগ্রত,—"আজ সে কেবল আর কারে ভালোবাসে।" নায়িকা আর কারো স্ত্রী হয়েছে, আর কাউকে ভালোবাসছে জানলে নায়কের অন্তরে বেদনা জাগবারই কথা। তবে কবি বেদনার্ত হন না। তাঁর যেমন বিদেশিনী, স্বদেশিনী অনেক নায়িকা, তেমনি তাঁর নায়িকাদেরও বিদেশী, স্বদেশী একাধিক নায়ক থাকতেই পারে। সে জন্য তিনি কিছু মনে করেন না। তিনি স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়ে, ক্ষণকালের মিলন সুখকেই শাশ্বত ক'রে পেতে চান। কবিতার শেষ চরণদ্বয়ে তাই জোরের সঙ্গে বলেন,—

"সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিবো না, আমি কভু ভুলিবো না।"

'কোটি মন্বন্তর' শব্দ গুচ্ছটি ব্যবহার ক'রে কবি তাঁর নায়িকাকে আর এক বার শাশ্বতী ক'রে তুলেছেন।

কবিতাটি যে এক অসাধারণ প্রেম কবিতা তা' ব'লে বোঝাতে হয় না। প্রকৃতির অনুষঙ্গ, গভীর প্রেমানুভূতি, রসভাবনা, আর শিল্পচেতনার সমন্বয়ে 'শাশ্বতী' একটি সুন্দর ও সার্থক প্রেমের কবিতা। এর আঙ্গিক সৌন্দর্যও পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে;

শাশ্বতী

শাশ্বত কবিতায় কবি কিভাবে দেহগত প্রেম থেকে শাশ্বত প্রেমের তীর্থে উপনীত হয়েছে তা আলোচনা কর।

OR

অথবা "অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিলো তার আনত দিঠির মানে।
একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী;"

অথবা

"সে ভুলে ভুলুক; কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিবো না, আমি কভু ভুলিবো না॥" [2+10]

২০০৮
(২২)

⇒ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫) কাব্যগ্রন্থের একটি নিটোল প্রেমের কবিতা হল শাশ্বতী। এই কবিতায় কবির আবেগ ঘন কামনা জর্জরিত চিত্র দেখতে পেয়েছি। প্রকৃতির বুকে বর্ষাশেষে যখনই শরতের আগমন ঘটেছে তখনই কবি তার স্মৃতির হাত ধরে খুঁজেছেন হৃদয়ের শাশ্বতীকে। কবিতাটির তিনটি স্তবকে কবি তার বিদেশিনী শাশ্বতীকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন দেহ মনের আঙিনায়। তখনই কবিতাটির হয়ে উঠেছে কবির আত্মগত প্রেম বেদনার স্বগত উক্তি।

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন রোমান্সের পূজারী। তার দেহ সর্বস্ব প্রেম অপরূপ মাধুরী নিয়ে কাব্য কবিতা গুলিতে উপস্থিত হয়েছে বারেবারে। প্রকৃতির মধ্যে উপলব্ধি করেছেন কামনা সুন্দরীকে। বৈষ্ণব কবিদের কাছে বর্ষা হল মিলন বিরহের কাল। কবি এখানে বর্ষা শরতের সন্ধিলগ্নটিকে বেছে নিয়েছেন বিরহ মিলনের মধ্যদিয়ে শাশ্বতীকে উপলব্ধি করার জন্য।

কবিতাটির প্রথম স্তবকে আছে বিরহ মিলনের আলো ছায়ার ছবি। বৈষ্ণব কবিদের মতো অহংস্ত্রীয়া অনুরাগে বলে উঠেছেন —

"শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া;"

এখানে কবি যখন ছায়ার বদলে 'কায়া' শব্দটি ব্যবহার করেন তখন প্রকৃতি মানবী রূপে হাজির হয়। এই মানবীর আলো ছায়ার লুকোচুরির খেলায় কবি বুঝেছেন- বিরহের কাল শেষ হয়ে উঠেছে। শরতের রাজকীয় আগমনের মধ্য দিয়ে প্রিয়া মিলনের স্বপ্নসুখ এসেছে। দীর্ঘ বিরহের শেষে শাশ্বতীর

অনুরাগে মিলন উৎসবে মেতে উঠতে চান তাই বলেন —
"বিরহবিচ্ছেদ ধৈর্যের দুঃসহিকা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালিসেজে।
মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকি,"
কিন্তু এই প্রকৃতি প্রতীকী মিলন কবিকে শান্তি দিতে পারেনি। তাই কবি বলেন —
"একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা।"
যে মিলনের আভাস কবি দেখেছেন তা শেষ হয়ে যায় তার সুখ প্রতীক্ষা চরিতার্থ হয়না কোনদিন। তাই কবি খন্ডিতা বিরহিনী নারীর মতই একবেণী হয়ে মলিন কাঁথায় আশ্রয় নেন।

কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে আছে অতীত মিলনের সুখ স্মৃতি চারনা। শাশ্বতীর সাথে অনিকে মিলনে ধন্য হয়েছিলেন তিনি। এই মিলনের স্মৃতি আজও মধুর হয়ে আছে তার মিলনে। আজ রাতে কবির কাছে তার প্রেয়সী এসেছিল। এই আগমনের মধ্যে কবি পেয়েছিলেন শত জন্মের রহস্য। প্রিয়ার আনত দিঠির মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন ছায়াপথ অমরাবতীর সুর। তার হাতের স্পর্শে শিহরন জেগেছিল মনে। দিবা রাত্র অধির চূড়ায় শাশ্বতী যখন তাকে নির্বাক সম্মতি জানিয়েছিলেন তখন কবি পেয়েছিলেন স্বর্গসুখ। কবি যখন হৈমন্তী অদ্বিতীয় অনুরাগের কথা বলেন তখন এই সুখ হয়ে ওঠে পরমানন্দ স্বরূপ।

সমগ্র কবিতাটির মধ্যে কবি দেহ সর্বস্ব প্রেম ছেড়ে শাশ্বত প্রেমের পরাকাষ্ঠা রূপে দেখেছেন। এইজন্যই প্রিয়ার আনত দিঠির মাঝে খুঁজতে গিয়ে অনাদি যুগের চাওয়া পাওয়ার কথা বলেন তিনি। যে প্রেম চিরকাল আনন্দ স্বরূপ। যে প্রেমের বারি সিঞ্চনে দেহমন পবিত্র হয়ে ওঠে সেই প্রেমই কবির কাম্যবস্তু। তাই এই প্রেমিকের কোন নাম নেই। সে যথার্থই শাশ্বতী। শরীর সুখ সর্বস্ব প্রেম কবিকে পরিতৃপ্ত করতে পারেনি বলেই মৌন প্রেমিকের অধির থেকে শুনতে চেয়েছেন চিরকালের নিঃশব্দ সম্মতির কথা।

কবি যখন দেখেছেন তার প্রেমিকা অনিকের জন্য ধীরা চলে অন্যের অনুরাগে কবিকে প্রত্যাখ্যান করে।

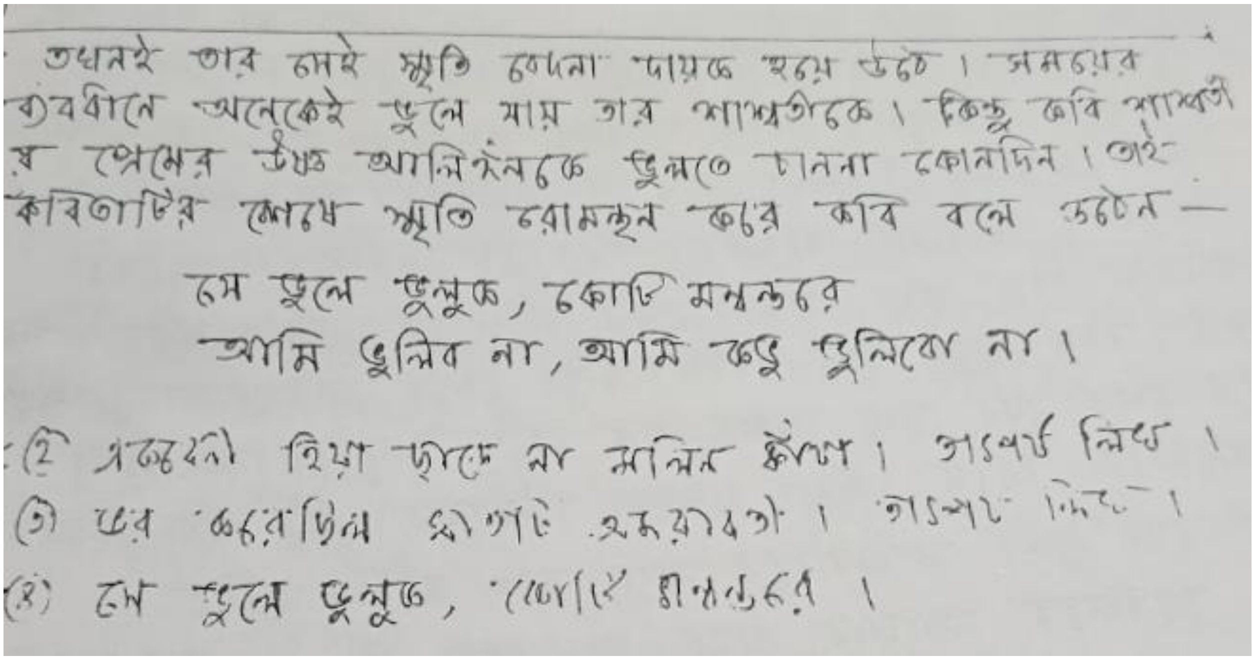
তখনই তার সেই স্মৃতি বেদনা জাগ্রত হয়ে উঠে। সময়ের ব্যবধানে অনেকেই ভুলে যায় তার শাশ্বতীকে। কিন্তু কবি শাশ্বতীর প্রেমের উষ্ণ আলিঙ্গনকে ভুলতে চান না কোনদিন। তাই কবিতাটির শেষে স্মৃতি রোমন্থন করে কবি বলে উঠেন —

সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিবো না।

(২) প্রত্যহের খিয়া জাগে না মলিন ক্লৈব্য। তাৎপর্য লিখ।
(৩) ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী। তাৎপর্য লিখ।
(৪) সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র- ফ্যান

আধুনিক কবিতা:-

প্রঃ- 'ফ্যান' কবিতার মর্মার্থ লেখ।

উঃ- শুধু নাগরিক জীবনেরই নয়, প্রেমেন্দ্র মিত্র সমকালীন জীবনেরও বিধ্বস্ত কবি। প্রথম মহাসমরোত্তর থেকে দ্বিতীয় মহাসমরের, পঞ্চাশের মন্বন্তর পেরিয়ে ও পরবর্তী আত্মদ্রোহ, অবশেষে রাষ্ট্রনৈতিক শৃঙ্খলামোচনের পর স্বাধীন ভারতের হতাশা ও নৈরাশ্য, অন্যায় ও অসত্য, লাঞ্ছিত আদর্শ ও তার বস্তুবীভবন- সমস্ত কিছুই কবির মানসদর্পণে প্রতি-বিম্বিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য 'ফ্যান' কবিতাটি সমকালীন জীবনের বিধ্বস্ত চিত্রে উদ্ভাসিত।

□ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল সময় কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন, প্রত্যক্ষ করেছিলেন ৫০-এর মন্বন্তরের ছবিও। কিভাবে দেশের এই কিছুসংখ্যক মানুষের অর্থক্ষুধা ভয়ঙ্কর দুর্দিনে মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করেছে, কিভাবে মানুষ মানুষকে পশুর চোখে দেখেছে তারই এক জীবন্তচিত্র কবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন 'ফ্যান' কবিতায়। 'অবতারণী' কবিতাতেও কবি এরই ইঙ্গিত দিয়েছেন—

"নাই ফুল, অন্নের মঞ্জরী।
বিস্ফোরণে বিদীর্ণ ক্ষিতিতল
উদ্‌গারিছে বিষবাষ্প," (অবতারণী)

□ মহাযুদ্ধের এই বিভীষিকাময় প্রেক্ষাপটে বাংলার বুকে নেমে এসেছিল ৫০-এর মন্বন্তর। ৫০ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণ দিয়ে যুদ্ধের দক্ষিণা চুকিয়ে যায়, অনেক বিবেক-বান কবি বাংলার এই মহাদুর্দিনের কাব্যরূপ দিয়েছেন। আমাদের আলোচ্য কবিতাটি কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই অনুভূতিতেই সমৃদ্ধ।

"নগরের পথে পথে দেখেছ অদ্ভুত এক জীব
ঠিক মানুষের মত—

পিচ্ছিল পিঠ নয়,
যেন তার ব্যঙ্গচিত্র বিদ্রূপবিকৃত!" (ফ্যান)

□ মন্বন্তরে ~~বিদ্ধ~~ বিধ্বস্ত মানুষগুলো কবির নজরের সামনে যেন 'ব্যঙ্গচিত্র বিদ্রূপবিকৃত' অদ্ভুত এক জীবনের প্রত্যক্ষ জেগেছে। 'তারা নড়েচড়ে, বহুবর্ণ জমাট বলে, রাস্তায় রাস্তায় – খুঁটতে খুঁটতে ঘুরে বেড়ানোর ঠিকানাহীন মানুষগুলি কেবলমাত্র 'ফ্যান' ভিক্ষা চায়, অথচ কিন্তু এই মানুষগুলি একদিন মালিক ছিল। সভ্যতাভিমানী ~~অর্থগৃধ্নু~~ অর্থগৃধ্নু (মানুষ)। মানুষদের প্রতি কবির ধিক্কার; – এদের লোভের তো-ভোগে নিয়ে যে ধনসম্পদ তারা জমিয়ে চলেছে তা কি;—

"এই অন্ন বহে নাকি মৃত্যুলোভাতুরা
অগ্নিজ্বালাময় তীব্র সুরা
বুকপাশে কাটি কাটি এইসব শিশুর কঙ্কাল মৃত্যুতন্দ্রাহীন
দধীচির হাড় ছিল এর চেয়ে অস্থিপূত কঠিন?"
(ফ্যান)

□ কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র মন্বন্তরদগ্ধ সেইসব মানুষদের আকাঙ্ক্ষার মূলে কোন দুষ্প্রাপ্য খাদ্যদ্রব্য নয় মানুষের প্রথম খাদ্যের উচ্ছিষ্ট 'ফ্যান' রেখেছেন। তাই কবির কলমেতে শোনা যায়— "রক্ত নয়, মাংস নয়
কয় ফোঁটা ভাতের মত খাঁটি সবুজ জলীয়,
মানুষের সভ্যতাই চায় শুধু ফ্যান,
তবু যেন সভ্যতার আজও লাগে ঘৃণা।"

রবীন্দ্রনাথ যাদের প্রসঙ্গে 'সভ্যতার পিলসুজ' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন তাদের সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভিযোগ হল 'মানুষের সভ্যতাই', প্রতিভাবান কবির হাতে আমাদের ~~প~~ চির পরিচিত শব্দ-ও যে নতুন অর্থ নতুন ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে, 'মানুষের সভ্যতাই' তারই সার্থক উদাহরণ।

দঃ প্রতি পরম সমবেদনায় কবি বলেছেন —

"একদিন এরা হয়তো ছিল নদী
তারপর ভুলে গেছে পারাপারি —
কত দিনে কত যুগ গেল;
ভুলে গেছে লাঙলের ফাল
ঘুঁটি তুলে খেলেছে সায়,
অনেকদিন নিয়েছিল খেটে,
জানে না বাকী আছে এক সমুদ্রের ঢেউ
পাহাড়-টিলাকে।" (সুকান্ত)

□ কবির দুঃখ, এসব মাটির মানুষ মরণের অসহায় শিকার হয়; কিন্তু তারা বাঁচার জন্য মরতে শেখেনি, বুঝতে পারেনি যে, তারা সূর্যসেনা, শুধু সূর্যসেনাই নয়- তারা সূর্যের সন্তান, যখন তাদের আত্মসংবিৎ ফিরে আসবে তখন তারা নিজের স্বরূপ চিনতে পারবে, বুঝতে পারবে, তাদের প্রাণে রয়েছে সূর্যশিখা। পৃথিবীর ইতিহাসে যুগে যুগে যখন মানবসমাজে এই সূর্যশিখা বহুর মধ্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠে, তখন মানুষ অর্জন করে তার আত্মার অধিকার।